PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-15, No.-1, May 2024

উচ্ছেদ-উন্নয়নের ইতিহাসে উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপাখ্যান: দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা

রাজশ্রী দত্ত

সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সরকারি মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার;
ইমেইলঃ *shreerajcollege33@gmail.com*

সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভারি আর বুনিয়াদী শিল্পের সে সরকারি উদ্যোগ তার তৃতীয় ফসল দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট। হাজার হাজার মানুষের রুটিরুজির আশ্রয় হয়ে ওঠে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর অঞ্চলটি। আর দেশের ভেতর সৃষ্টি হয় একদল নবীন উদ্বাস্তু কারণ শিল্পস্থাপনের পরিকল্পনাটিকে কার্যকর করার জন্য দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানার অন্তর্গত বেশ কয়েকটি সমৃদ্ধ গ্রামের মানুষদের হাতে পৌঁছে যায় পিতৃভূমি থেকে উচ্ছেদের পরোয়ানা। কয়েকহাজার পরিবার গ্রাম ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এখানে ওখানে। নামমাত্র ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে হারিয়ে যায় এঁদের ভিটেমাটি, পরিচয়। উন্নয়নের ইতিহাসে যাঁরা উপেক্ষিত, নিতান্তই অবহেলিত। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা বাস্তুহারা মানুষেরা শিল্পায়ন পর্বে উন্নয়নের স্বার্থে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু জীবনকে স্বেচ্ছায় (খানিকটা সরকারী চাপে) গ্রহণ করেছিলেন- এই শিল্পায়ন তাদের জীবনে কতটা সুদিনের সম্ভাবনা বহন করে এনেছে? এইসব পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিল্পায়নের অমৃতকে কতটা ভোগ করতে পেরেছে? সর্বোপরি উন্নয়নের স্বার্থে বাস্তুহারাদের জীবনে শিল্পায়নের প্রভাব অনুসন্ধানের ক্ষুদ্র এক প্রয়াস এই নিবন্ধটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উন্নয়নভূমি সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম নিয়ে এত হৈ-চৈ অথচ ১৯৫০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে এক নীরব বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল দুর্গাপুরে। হয় নি কোন দাঙ্গা, ঘটে নি কোন রক্তপাত। কেমন ছিল সেদিনের প্রতিবাদ- প্রতিরোধের ধরন? কেমনই বা ছিল ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ?- এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এ লেখার আয়োজন।

Primary source হিসেবে আমি ব্যবহার করেছি Burdwan Census, Gazetters, সরকারি নথিপত্র এবং মৌখিক সাক্ষাৎকার। Secondary Source হিসেবে ব্যবহার করেছি শিল্পাঞ্চলের উপর লেখা বেশ কিছু গ্রন্থ ও উপন্যাস। এছাড়াও তথ্যসূত্র হিসেবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে সংগৃহীত নথি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আমি গ্রামবাসীদের মৌখিক সাক্ষাৎকারকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। কারণ আমার মনে হয় একদিকে উন্নয়ন ও অপরদিকে বাস্তুহারানোর যন্ত্রণা কিভাবে শিল্পনগরীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ পরিবারগুলোকে আলোড়িত করেছে সেই বিষয়বস্তুর ভিত্তি হিসাবে মৌখিক কথাই হবে যথার্থ---- যাকে ঘিরে রচিত হবে অন্য ইতিহাস যা অনেকটা সাধারণ মানুষের মনের ইতিহাস।

সূচক শব্দ: উন্নয়ন, উচ্ছেদ, শিল্পায়ন, বাস্তুহারা, দুর্গাপুর, ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, আনন্দগোপাল মুখার্জী, লাবণ্য ঘটক

"কেবলি নগর ঘর ভাঙে, গ্রাম পতনের শব্দ শোনা যায়"

এই বাস্তবতা তথাকথিত উন্নয়নশীল সভ্যতার প্রতিদিনের দুঃস্বপ্ন। আজ দুর্গাপুরে যেখানে যন্ত্রসভ্যতার দুর্নিবার অগ্রচারিতা, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তা ছিল কিছু গ্রামবাসীর নিবিড় আশ্রয়। ১৯৫০ এর

দশকের মাঝামাঝি সময় দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্পের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য বেশ কিছু গ্রামকে তুলে ফেলা হয়। হারিয়ে যায় দুর্গাপুরের বুক থেকে বেশ কিছু সমৃদ্ধ গ্রাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই নিবন্ধে আলোচনার জন্য যে বিষয়টি আমি নির্বাচন করেছি তা অংশত দুর্গাপুরের ইতিহাস বা একটা স্থানীয় ইতিহাস এটা খানিকটা আবার শিল্পায়ন ও নগরায়ণেরও ইতিহাস। কিন্তু প্রধানত এই ইতিহাস হয়ে উঠবে সেই সব গ্রামীন মানুষের ইতিহাস যারা উন্নয়নের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল। শিল্পায়নের চাপে যারা মাটি ও শিকড় হারিয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছিল।

এই নিবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে কিছু কথা আমি ভূমিকাতেই উল্লেখ করে নিচ্ছি। এই নিবন্ধের sample হিসাবে যে জায়গাটিকে আমি নির্বাচন করেছি তাহল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীন ৩৫ নং ওয়ার্ড গোপালমাঠ এলাকাটিকে। যেখানে পুনর্বাসন পেয়েছেন ১৯৫৫ সালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার জন্য বাস্তুহারা আটটি গ্রামের (মেজেডিহি, সুজড়া, জগুরবাঁধ, নাগারবাঁধ, পুনাবাঁধ, মোহনপুর, ধনুরা, বনগ্রাম) মানুষেরা। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মেজেডিহি ও সুজড়া গ্রামের ভূমিপুত্ররা উঠে আসেন গোপালমাঠের সরকারী তাঁবুতে। এই গ্রামগুলো আজ শুধুই ইতিহাস। গ্রাম কিভাবে শিল্পনগরীতে পরিণত হল? সবুজ প্রান্তর কীভাবে চিমনির ধোঁয়া সম্বন্বিত যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে পরিণত হল? কীভাবে গ্রাম দুর্গাপুর কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার খোলস ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে থাকে শিল্পায়নের পথে, তা ঐতিহাসিকের কৌতূহলের বিষয় হতে পারে। শিল্পায়ন এবং নগরায়নের ধারাকে বোঝা এবং বাস্তুহারাদের জীবনে শিল্পায়নের প্রভাব অনুধাবনের জন্য এই নিবন্ধের Period হিসেবে নির্বাচন করেছি ১৯৫১-১৯৯১ পর্যন্ত সময়কালকে।

কলকাতা থেকে ১৫৮ কি.মি পশ্চিমে এবং রেলপথে ১৭১ কি.মি দূরত্বে দুর্গাপুরের অবস্থান। ভৌগোলিক মানচিত্রে ২৪°১৫' উত্তর ও ৮৭°৫৫' পূর্বদিক চিহ্নিত।[১] উনিশ'শ পঞ্চাশের দশকের আগে দুর্গাপুর ছিল শাল মহুয়ায় ঘেরা এক সবুজ বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ১৯৫১ সালের Census Report অনুসারে দুর্গাপুর ছিল আসানসোল মহকুমার ফরিদপুর থানার অন্তর্গত একটি Union। এই রিপোর্টে ফরিদপুর থানা অঞ্চলকে একটি গ্রামাঞ্চল হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আরো জানা যাচ্ছে সেই সময় ফরিদপুর থানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল প্রায় ৪৫ টি গ্রাম।[২] যার জনসংখ্যা ছিল ২৭,৪৪৬। মাইলের পর মাইল শুধু শাল-মহুয়ার জঙ্গল আর জঙ্গল। বসতি বলতে হাতে গোনা কয়েকটি শতাব্দী প্রাচীন গ্রাম---- বীরভানপুর, নডিহা, অঙ্গদপুর, রাতুড়িয়া, পলাশডিহা, অর্জুনপুর., সগড়ভাঙা, বামুনাড়া, মোহনপুর.....।[৩]

সরল গ্রাম্য জীবন। একটি গ্রামের সঙ্গে অন্যটির দূরত্বও বিস্তর। রাস্তাও ছিল না। জঙ্গলের বুক চিড়ে ছোট ছোট আলে ঘেরা চাষের জমি। মানুষের জীবিকার সম্বল বলতে সেটুকুই। বিপদের ঝুঁকি ছিল প্রতি পদে। জঙ্গলে জীবজন্তু বিস্তর। সঙ্গে ছিল লেঠেল বা ডাকাতের উপদ্রব। তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকায় যার রোমহর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়।[৪] এই অঞ্চল ছিল বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ছিল শাল, পলাশ, মহুয়া ও কেন্দ গাছের বিশাল জঙ্গল। জানা যাচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহু আগে থেকেই এই জঙ্গল কাঠ ব্যবসায়ীদের একটা বড় কর্মকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। দুর্গাপুর অঞ্চলে কাঠ সরবরাহের অন্যতম বড় ব্যবসায়ী ছিল বেঙ্গল কোল কোম্পানী।[৫] ১৮৫৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী হাওড়া

হুগলী রেলপথকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে। ফলে এই রেলপথের মাধ্যমে একদিকে যেমন রাণীগঞ্জের কয়লা সরবরাহ করা হতো তেমনই অন্যদিকে দুর্গাপুরের ঘন বনাঞ্চল থেকে কাঠও সরবরাহ করা হতো। এই রেলপথের মাধ্যমে কাঠের যোগানকে নিশ্চিত করার জন্যই দুর্গাপুরে অবস্থিত গোপীনাথপুর মৌজায় একটি ছোট রেলস্টেশন স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেছিল ইংরেজ বণিক কোম্পানী। এই স্টেশনটির নাম রাখা হয়েছিল দুর্গাপুর। এই স্টেশনটির নাম থেকে বিরাট একটি অঞ্চল দুর্গাপুর নামে পরিচিত হয়েছে।[৬] ১৯৫১-র সেন্সাস রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করলে জানা যাচ্ছে শুধু ব্যবসা বাণিজ্য নয়, এই অঞ্চলে ভালোরকম কৃষিজ উৎপাদনও হতো। ধান, আখ, ডাল জাতীয় শস্য, সরষে ও বিভিন্ন সব্জির চাষ হতো প্রায় সারা বছর ধরেই এবং প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল কৃষিকাজের সঙ্গে।[৭]

তবু এই এলাকার অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পগঠনের পক্ষে আদর্শ।[৮] অজয় ও দামোদর অববাহিকার মধ্যে আয়তাকার দেড়শো বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চলের অদূরে কয়লার অফুরাণ ভাণ্ডার। আয়তক্ষেত্রকে চিড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে জি টি রোড---- কলকাতা কিংবা ভিন্ রাজ্যের সঙ্গে অনায়াস যোগাযোগের মাধ্যম। কোল ঘেঁষে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে রেলপথ দেশের নানা প্রান্তে। পার্শ্ববর্তী জেলা বাঁকুড়া, বীরভূম একেবারে গা-ছোঁয়া। এই বাস্তবতার সাকার রূপ দিলেন রাজ্যের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। মূলত তাঁরই উদ্যোগে বনাঞ্চল ধীরে ধীরে পাল্টে হল 'রূঢ় অব ইন্ডিয়া'।[৯] জন্ম নিল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল।

দুর্গাপুর রূপান্তরের সূচনা ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে, দামোদর ভ্যালি করপোরেশন গঠনের সময় থেকেই। ১৯৫২ সালে দামোদর বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। শুরু হয় নগরায়নের যাত্রা, দ্রুত বদলাতে থাকে এই অঞ্চলের আভ্যন্তরীন মানচিত্র। ১৯৫৫ সালের ৯ই আগষ্ট এই বাঁধের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান।[১০] এই ব্যারেজের মাধ্যমে একদিকে যেমন বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলাকে একসূত্রে গেঁথে দেওয়া হয় তেমনই সঠিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী নয় লক্ষ তিয়াত্তর একর পরিমাণ খারিফশস্য, আর পঞ্চান্ন হাজার একর পরিমাণ রবিশস্যের জমিতে জলসেচের সম্ভাবনা দেখা দিল। দুর্গাপুরে আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন বলতে এই সময় থেকে। ১৯৫৮ সালে ওয়ারিয়া রেল স্টেশনের কাছে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন আর একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে। নাম 'দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন' (DTPS)।[১১]

১৯৫০-এর দশকের শেষ থেকে শুরু করে ১৯৬০ এবং ৭০-এর দশকে দুর্গাপুরে গড়ে ওঠে আরো অনেক কারখানা।[১২] অতি সংক্ষেপে সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হল। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য এ্যালয় স্টীল প্ল্যান্ট (১৯৬৩), মাইনিং এ্যান্ড অ্যালায়েড মেশিনারী কর্পোরেশন (১৯৫৯), দুর্গাপুর কেমিক্যালস (১৯৬৩), ভারত অপথ্যালমিক গ্লাস লিমিটেড (বিওজিএল) ১৯৬৫, হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন (১৯৬৬)। প্রাইভেট শিল্প হিসাবে উল্লেখযোগ্য ফিলিপস্ কার্বন (১৯৫৮), এসিসি ব্যাবকক্ লিমিটেড (১৯৬০),শ্যাঙ্কি হুইলস (১৯৬৩), গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড (১৯৬৪), এশিয়াটিক অক্সিজেন লিমিটেড (১৯৬২), দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস (১৯৭২), মর্ডান সেরামিক প্রাঃ লিঃ

(১৯৭৮)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে গড়ে ওঠে যেসব শিল্পসংস্থা সেগুলি হল উড্ ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কশপ, দুর্গাপুর কেমিক্যালস্ লিমিটেড (১৯৬৩),গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড (১৯৬৪), হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার করপোরেশন (১৯৬৬), দুর্গাপুর স্টেটস্ ডেয়ারী (১৯৬৬), ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (১৯৬৬), বাস্তবধর্মী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে দুর্গাপুরে কারিগরি শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৬০ সালে রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে গড়ে ওঠে দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, তৃতীয় পদক্ষেপ হিসাবে গড়ে ওঠে সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউশন। রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে গড়ে ওঠে পরিবহন সংস্থা দুর্গাপুর স্ট্রেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন।

১৯৫৬ সালের ৩১ অক্টোবর, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের পরিকল্পনাটিকে কার্যকর করার জন্য ১৬ টি গ্রামের ১৯৫৩ টি পরিবারের হাতে পৌঁছে যায় পিতৃভূমি থেকে উচ্ছেদের পরোয়ানা/ উচ্ছেদ নোটিশ।[১৩] পরিকল্পনাটি কার্যকর করার জন্য ফরিদপুর থানার ১৬টি গ্রামকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়। ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৮টি গ্রামকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এগুলি হল;---- (১) মেজেডিহি, (২) সুজরা, (৩) মহনপুর, (৪) জগুরবাঁধ, (৫) ধুনরা, (৬) পুনাবাদ, (৭) বনগ্রাম, (৮) নাগারবাঁধ।[১৪] এই আটটি গ্রাম ছাড়াও পরবর্তী সময়ে আরও আটটি গ্রামকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল কারখানার কারণেই যা এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। উচ্ছেদ প্রক্রিয়াটির সাথে পুনর্বাসনের প্রশ্নটি জড়িত না থাকায় শিক্ষিত, কর্মসূত্রে বাইরে থাকতেন, কোলিয়ারিতে চাকরি করতেন, এমন লোকেরা গ্রাম ছাড়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কিন্তু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধান চন্দ্র রায়[১৫], দুর্গাপুরের MLA আনন্দগোপাল মুখার্জি[১৬], লাবণ্য ঘটকের[১৭] সহায়তায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধ দানা বাধতে পারেনি। এই দুজন ব্যক্তি দুর্গাপুরের উচ্ছেদ উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন। সেদিনের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এই দুই ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে দুর্গাপুরের বুকে শিল্পায়নের প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন।

বিধানচন্দ্র রায় দুর্গাপুরকে আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের দল কংগ্রেস সেই সময় কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকলেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবকে বিশেষ একটা আমল দেয়নি তারা। তবে দক্ষ প্রশাসক বিধানবাবু কেন্দ্রের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েও হাল ছেড়ে দেননি। রাজ্য সরকারের চেষ্টাতেই দুর্গাপুরকে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। পরে অবশ্য সম্ভাবনার বিষয়টি বুঝতে পেরে অবস্থান পাল্টে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল কেন্দ্রও। দিল্লির সম্মতি পাওয়ার পরই দুর্গাপুরে শুরু হয় ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার কাজ। দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার জন্য প্রথম দরকার ছিল জমি অধিগ্রহণের। যার মধ্যে বেশিরভাগটাই ছিল কৃষি জমি। তবে ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠলে ওই এলাকার কতটা উন্নতি হতে পারে তা আগেই বুঝেছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। এই কাজে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন দুর্গাপুরের ভূমিপুত্র তথা রাজনীতিবিদ আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। বিধানচন্দ্র রায়ের সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল তাঁর পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া। তিনি কখনই চাননি উন্নয়নের স্বার্থে গ্রামের মানুষকে

বলপূর্বক উঠিয়ে দিতে। তাদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন কোনো বিক্ষোভ ছাড়াই। আর তাই দুর্গাপুর গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে এসে সরকারের হাতে জমির দলিল তুলে দেন সেখানকার কৃষকরা। এই প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ তথ্য প্রদান করেন দুর্গাপুরের বাসিন্দা ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য।[১৮] বিধানসভায় দুর্গাপুরের বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় বিধান বাবু সেখানকার ভূমিপুত্র আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়কে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে কেন দুর্গাপুরকে নতুন একটি শহর হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন এই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন কিন্তু এর পরই আসে বড় চমক কলকাতার বাসিন্দা বিধানচন্দ্র রায় প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে দুর্গাপুর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেখানে দুর্গাপুর শহর সম্বন্ধে এতো বিস্তারিত তথ্য ছিল যে চমকে গিয়েছিলেন আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়'ও।

আনন্দগোপাল মুখার্জি ছিলেন তৎকালীন দুর্গাপুরের MLA, ড. বিধানচন্দ্র রায়-এর স্নেহধন্য এবং ভিরিঙ্গী জমিদার বংশের সন্তান যাকে স্থানীয় মানুষজন শ্রদ্ধা করতেন। এই মুখার্জি পরিবারই এলাকায় বিদ্যালয়, চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন এবং দান-ধ্যানের জন্য সুনাম অর্জন করেছিলেন। লাবণ্য ঘটক ছিলেন আনন্দগোপাল মুখার্জির সহপাঠী এবং গ্রামে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত লাব্যণ্য ঘটককে গ্রামের লোক নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। মেজেডিহি গ্রামের লাবণ্য ঘটক ১৯৫০-এর দশকের ছিলেন ইন্ডিয়ান রেলের কর্মী। আসানসোলের DRM অফিসে তিনি চাকরি করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই লাবণ্য ঘটক কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬০-এর দশকের গোড়ায় তিনি INTUC এর সভাপতি হন। তাই গ্রামবাসীদের গ্রাম ছাড়তে রাজি করানোর দায়িত্ব এই দুই ব্যক্তির উপর অর্পণ করেছিলেন ড. বিধান চন্দ্র রায়।

গ্রামের সরল মানুষগুলো মৌখিক প্রতিবাদে সামিল হলেও প্রশাসনের চাপে গ্রাম ছাড়তে রাজি হয়। যেহেতু তাদের সামনে এই ধরনের কোনো মডেল ছিল না। গ্রাম ভেঙে শিল্প হলে তার ভবিষ্যৎ কি হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের পরিষ্কার ধারণা ছিল না। শিল্পকারখানার জন্য বাস্তুহারাদের সেদিন বোঝান হয়েছিল কারখানা হলে বাস্তুহারা পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বংশ পরম্পরায় কারখানায় স্থায়ী চাকরীতে নিযুক্ত হবে।এই মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন স্বয়ং ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। যদিও এই ব্যাপারে স্টিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো লিখিত চুক্তি না হওয়ায় শিল্পস্থাপনের প্রাথমিক পর্বে বাস্তুহারা পরিবার পিছু একজন, ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক জন শিল্পকারখানায় চাকরি পেলেও- পরবর্তী প্রজন্মের চাকরির নিশ্চয়তা আর থাকে না। এমনকী কারখানার জন্য সর্বহারা হয়েও ৫৫টি পরিবার এই কারখানায় চাকরি পেলেন না। যারা চাকরির দাবি নিয়ে আজও মামলা লড়ছেন।[১৯]

মধু চট্টোপাধ্যায়ের[২০] লেখা এবং দীর্ঘদিন বাস্তুহারা পরিবারগুলির উপর সমীক্ষা চালিয়ে জানা যাচ্ছে বাজার চলতি দামের চেয়ে অনেক কম দাম তাঁরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়েছেন। জগুরবাঁধ গ্রামের ভূমিপুত্র এবং রায় পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্যাম রায়[২১] এর ব্যক্তিগত হিসেবের খাতা থেকে প্রাপ্ত তালিকা হতে দাম ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। তা নিম্নে উল্লেখ করা হল---

১. পাকা দোতলা বাড়ি (৮-১০ কাঠা জমির উপর)- ৫ হাজার ৫৯ টাকা, ৯ আনা
২. একতলা পাকা দালান বাড়ি (৬ কাঠা জায়গার উপর)- ২ হাজার ৪৬৪ টাকা।
৩. বাড়ির বাউন্ডারি ওয়াল ও কুয়ো বাবাদ- ৬৪৪ টাকা, ৭ আনা
৪. বড়ো গোয়ালঘর (১ বিঘা জমির উপর)- ১৬৬ টাকা
৫. বিরাট খামার বাড়ি (৩ বিঘা জমির উপর)- ৩৪৮ টাকা ৭ আনা
৬. তিন বিঘা কানালী জমি (উর্বর জমি)- ২ হাজার ৬২৯ টাকা

সবচেয়ে বড়ো কথা সরকারি তরফ থেকে দামের ব্যাপারে কোনো তালিকা দেওয়া হয়নি গ্রামবাসীদের। যাতে তাঁরা বুঝতে পারবে যে কোনো জমির জন্য কী দাম পাওয়া যেতে পারে। যখন কোনো জমি, বাড়ি মাপ করা হচ্ছে তখন বাড়ির মালিক সার্ভেয়ার বা কালেক্টর সাহেবের মুখের উপর কোনো কথা বলতে পারেনি। তাই পরে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে একই জমির দুরকম দাম ধরা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়াটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সরকার থেকে কর্মচারী আসত গ্রামে যারা মূলত গ্রামীণ মানুষদের সম্পত্তি (জমি, শস্যক্ষেত, পুকুর, বাগান, বাস্তুভিটে) জরিপ করে লিপিবদ্ধ করতেন। বর্ধমান ল্যান্ড এ্যকুইজিশন অফিস থেকে আগত এইসব সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সার্ভেয়ার পরেশ ব্যানার্জী, নগেন বণিক এবং কখনো কখনো সঙ্গে থাকতেন তৎকালীন কালেক্টার সাহেব এ.কে.ব্যানার্জি। এদের সঙ্গে থাকতেন গ্রামের প্রভাবশালী নেতা ও মোড়ল।[২২]

জানা যাচ্ছে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের মোট ব্যয় হয় ১,৮৬,৪০,০০০ টাকা।[২৩] বাস্তুচ্যুত ১৯৫৩টি পরিবারের মধ্যে ১৩২২টি পরিবার ছিল কৃষিজীবী। ৪৫৮ টি পরিবার ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। বাকিদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হতো কৃষি ছাড়া চাকরি ও ব্যবসা ক্ষেত্র থেকে। ৫ বিঘা জমির মালিক ৪৩৫টি পরিবার ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল ৫-৬ হাজার টাকা করে। ৫০ বিঘা জমির মালিক ৯২৫টি পরিবার ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল ২৫-৩০ হাজার টাকা করে। ৬০ বিঘার উপর জমি ছিল এমন ১২৫টি পরিবার ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল ৫০-৬০ হাজার টাকা করে। বাকি ৪৫৮ জন ভূমিহীন ভাগচাষি যাদের কুঁড়েঘর সম্বল ছিল, তারা পেয়েছিল ৩০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ।

তবে আর্থিক ক্ষতিপূরণ সবাই পাননি। জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র যাঁরা দেখাতে পেরেছেন তাঁদের একটা অংশ জমির বিনিময়ে অর্থ পেলেও মূল্যবৃদ্ধি, আধুনিক অর্থনীতির ব্যাপারে অনভিজ্ঞতা এবং ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে কী করবেন সে বিষয়ে তাঁদের অধিকাংশেরই যথার্থ কোনো ধারণা না থাকায় সে অর্থ অল্পদিনেই অন্তত অর্ধেকেরই হাতছাড়া হয়েছে। অভাব, নেশা বা কন্যাদায়ের তাড়নায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন অনেকেই।[২৪] আবার এটাও তো ঠিক একটা জমিতে জীবিকাসূত্রে যুক্ত থাকেন বহু মানুষ, যারা জমির মালিক মন, যেমন নথিতে নাম না থাকা প্রান্তিক চাষি, ভাগচাষি, ক্ষেতমজুর বা অপ্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কৃষিশ্রমিক। কাগজে-কলমে তাঁদের মালিকানা না থাকলেও জমি চলে যাওয়ায় তাঁরাও কর্মচ্যুত হয়েছেন। সেটা বিরাট ক্ষতি- যার কথা সরকারি রিপোর্টে পাওয়া যায় না, এই ক্ষতিগ্রস্থ মানুষগুলো থেকে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে।[২৫] এই ক্ষতিপূরণ করার কথা কিন্তু ভাবা হয়নি।

কারখানা হলেও বাস্তুহারা পরিবারের সদস্যদের যে প্রত্যেকেরই কারখানায় কাজ জুটেছে তাও নয়। কারণ এমন ৫৫টি বাস্তুহারা পরিবার শিল্পের জন্য জমি, বাস্তুভিটে হারিয়েও প্রতিশ্রুতি মতো কারখানায় একটা কাজ পেলেন না। অথচ ভিন্ন জেলা থেকে কত লোক এসে এই দুর্গাপুরের কারখানাগুলোতে চাকরি জুটিয়ে নিয়ে স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছেন। শিল্পায়নের ফলে কর্মসংস্থান বাড়লেও এই বাস্তুহারা ৫৫টি পরিবার কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এঁরা কারখানায় নির্মাণপর্বে স্থায়ীভাবে না হলেও সাময়িক কাজ অবশ্য কখনো সখনো পেয়েছেন। পরবর্তী সময় এইসব পরিবারের পুরুষরা জীবনধারণের জন্য নানা পেশা অবলম্বন করলেও অভাব মেটেনি, যাঁর প্রভাব পড়েছে তাঁদের পরিবারে, ব্যক্তিজীবনে। আবার এইসব পরিবারের মহিলারা কেউ কেউ লোকের বাড়িতে রান্না, ঠিকে, আয়ার কাজ, শপিং মলে কাজ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

দুর্গাপুরের বাস্তুহারা মানুষদের বাজার চলতি দামের থেকে কম টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। জমি, পুকুর, বাস্তুভিটের জন্য সরকারি তরফ থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কখনোই লাভজনক হয় না, কারণ শিল্প স্থাপনের আগে জমির যা দাম থাকে শিল্পায়নের পরবর্তী পর্যায়ে ওই জমিটির দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট জমির দাম তিনগুন বেড়ে যায়। সরকারি মতে কৃষকদের জমির দাম দিয়ে দিলেই ক্ষতিপূরণ বলা যায়? তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আরও অনেক বিষয়। একজন চাষি যিনি জমি হারালেন, তাঁর পেশা ছিল কৃষিকাজ, জীবিকাচ্যুত হওয়ার পর স্বাধীনভাবে চায়ের দোকান চালানো বা অন্য কোনো ব্যবসা পদ্ধতি তাঁর না-ই জানা থাকতে পারে। এই যে কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একজনের একটি বিশেষ দক্ষতা নষ্ট হয়ে গেল, তাঁর ক্ষতিপূরণ কখনো দেওয়া হয় না। একজন কৃষকের কৃষিকাজে যে স্বয়ংক্রিয়তা থাকে, সৃজনশীলতা থাকে, সেই কৃষকই যখন কারখানায় লোহার পাতে হাতুড়ি পেটায় তখন সেসব আর তাঁর থাকে না। সৃষ্টিশীল মনটা নষ্ট হয়ে যায়। এই ক্ষতিপূরণের কথা কখনো ভাবা হয় না। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় ভাবা উচিৎ কৃষকসমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির কথা। মাঠের খোলামেলা পরিবেশে একজন চাষি কাজ করতেন তাঁর প্রভাব রয়েছে তাঁর মনে, তাঁর সংস্কৃতিতে। এই পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করা হচ্ছে তাঁকে। এই ক্ষতিপূরণের দাবি কি অন্যায়?[২৬]

নগরজীবনে নারীরা যে ধরনের সমাজিক সমস্যার সম্মুখীন হন, কৃষিভিত্তিক গ্রামজীবনে তাঁদের ক্ষেত্রে ওই ধরনের সমস্যার প্রকোপ তুলনামূলকভাবে কম। কারণ কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর শ্রম পুরুষের শ্রমের সমান মূল্যবান। গ্রামজীবনে কৃষিজ উৎপাদন পুরুষ ও নারীর যৌথ শ্রমের মূল্যেই পূর্ণতা পায়, সম্পূর্ণ হয়। আর তাই কৃষিভিত্তিক সমাজে নারী শহরের তুলনায় পায় অনেক বেশি স্বাধীনতা, সম্মানের পরিসর।[২৭] খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রাম ভেঙে শিল্প হলে এই পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হন মহিলারা, আঘাত পড়ে তাঁদের প্রতিবেশী পরিবৃত্ত নিরাপত্তা বোধের উপর। তাই বোধ হয় দুর্গাপুর থেকে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে প্রতিরোধের সামনের সারিতে মহিলারা এসে দাঁড়িয়েছিলেন।[২৮]

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস, মেজেডিহি ও সুজড়ার বাস্তুহারা মানুষগুলো উঠে আসে গোপালমাঠের সরকারী তাঁবুতে। সামনে তখন দুটো জ্বলন্ত সমস্যা (১) মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরী করা ২) দৈনন্দিন

রুটি সংগ্রহ করা। জীবনে তাদের নতুন অধ্যায় শুরু হল। গ্রামের প্রবীণ অধিবাসীদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যাচ্ছে উচ্ছেদের পর চাষের উপর নির্ভরশীল মানুষেরা প্রথম জীবিকাচ্যুত হল। ভাগচাষী যেমন তার চিরাচরিত অভ্যস্ত পেশা কৃষিকাজ ছাড়তে বাধ্য হলেন, তেমনই বাগাল মুনিস এরাও কর্মহীন হলেন সাময়িকভাবে। নিম্নবর্ণের মহিলা ও শিশুরা চেনা জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন। মহিলারাও কাজ হারালেন সাময়িকভাবে। নিম্নবর্ণের মানুষেরা বেশির ভাগই পরে পেটের ভাত জোগাড়ের জন্য কারখানায় অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে যোগদান করে। আর জমিদার পরিবারের ছেলে, অবস্থাপন্ন চাষী এঁদের চাকরি করার মানসিকতা ছিল না বলে ক্ষতিপূরণের টাকায় স্বাধীনভাবে ব্যবসায় নেমে পড়েন। কর্মসূত্রে বাইরে থাকতেন যে সব গ্রামের মানুষ তারা পুনর্বাসনের সুযোগ নিলেও যে জমি পেয়েছিলেন তা পরিবারের অন্য সদস্যকে (ভাই বা দাদাকে) বিক্রি করে দিয়ে কর্মস্থলে পাকাপাকি ভাবে থেকে গেছেন। উৎসব অনুষ্ঠানে গ্রামে এলেও গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেছে।[২৯] উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ পুনর্বাসনের সুযোগ নিলেও তাঁর অংশের জমি তিনি তাঁর ভাইদের বিক্রি করে দিয়ে পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় থেকে গেছেন।

কারখানা তৈরীর জন্য প্রয়োজন শ্রমিকের, তাই উদ্বাস্তু পরিবারের লোকেদের অনেকের পক্ষেই চাকরি পেতে অসুবিধা হয়নি। স্থানীয় নেতাদের মুখের কথায় অনেক পরিবারের একজন (কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি) করে কারখানায় কাজ পেয়েছিল। গ্রামের নিম্নবর্ণের মহিলারা কারখানায় মাটি কাটা, ইট বওয়া ইত্যাদি কাজে যোগ দেয় দৈনিক দেড় টাকা এবং সাপ্তাহিক দশ টাকা মজুরিতে। আর অদক্ষ শ্রমিকের মাসিক বেতন ছিল সর্বনিম্ন ৩৫ এবং সর্বোচ্চ ৭৫ টাকা।[৩০]

ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এক বড় পরিবর্তন সূচিত হয়। তার সবটাই যে খারাপ তা নয়। গ্রামে থাকতে যারা বাগাল মুনিসের কাজ করতো, একটা কুঁড়েঘর মাত্র সম্বল ছিল, জীবনধারণের জন্য যারা অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, তারাও যখন যোগ্যতা অনুযায়ী কারখানায় কাজ পেল, তখন দু'পয়সা রোজগার করতে পারল। সমাজে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেল এবং চাকরিকে সম্বল করে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারল। কারখানার গেটের বাইরে সে 'বাবু' বলে পরিচিতি লাভ করল। এদের সামাজিক সম্মান আগের তুলনায় অনেকটাই বাড়ল।

নিম্নবর্ণের মহিলা যাঁরা গ্রামে থাকতে অন্যের বাড়িতে কামিন খাটতেন, মাঠে চাষের কাজ করতেন, তারাও যখন অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কারখানায় যোগ দিলেন তখন তাদের জীবনেও এল পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনটা মূলত আর্থিক কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামাজিক। গ্রামে পরিশ্রমের বিনিময়ে কখনো পয়সা পাননি। কিন্তু কারখানায় যোগ দেওয়ার পর হাতে নগদ টাকা এল। বাড়ির পুরুষ সদস্যটির কাছে, আত্মীয় পরিজনদের কাছে, তার সামাজিক সম্মান আগের তুলনায় নিঃসন্দেহে বাড়ল। শুধু পেটের ভাত নয়, সংসারের উন্নতির জন্য সে টাকা বিনিয়োগ করল। নিজে লেখাপড়া শেখার সুযোগ না পেলেও তার শিশুসন্তানটিকে স্কুলে পাঠাল। নিজের স্বামীর কাছে, সমাজের কাছে কেবল নারী হিসেবে নয়, মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠা পেল।

আবার গ্রামে যারা জমিদার ছিলেন, অবস্থাপন্ন চাষী ছিলেন, যাদের উপর নির্ভর করে গ্রামের আরো পাঁচটা পরিবার বেঁচে থাকত, তাদের চাকরি করার মানসিকতা ছিল না বলে এরা অনেকেই স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করল। কিন্তু ক্রমশই ব্যবসায় ক্ষতি হতে লাগল, যার প্রভাব পড়ল তাদের ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে। এদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। এঁরা হারালেন অনেক কিছুই। আর মোটের উপর লাভের থেকে লোকসানের পাল্লা যে অনেক ভারি হল তাতে সন্দেহ নেই। সেটা ক্রমশই আমাদের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে।

একান্নবর্তী পরিবারগুলো গোপালমাঠে উঠে আসার পর ভেঙে গেল। কয়েকবছরের মধ্যেই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল এখানে ওখানে। সুখী বাবুজীবন কাটানোর উদ্দেশ্যে কেউ কেউ চলে গেলেন কোয়ার্টারে। যদিও এমন ব্যক্তির সংখ্যা কম। বাকি যারা গোপালমাঠে রয়ে গেলেন, চাকরির বাজার ক্রমশ সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে আজ এদের পরিবার চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, মেজেডিহির আদি জমিদার নয়নসুখ মুখোপাধ্যায়ের বংশধর লাবণ্য ঘটক। যিনি শিল্পায়নের প্রথম পর্বে ছিলেন এ অঞ্চলের প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং শিল্পস্থাপনে যাঁর খুব বড় ভূমিকাও ছিল, তাঁর উত্তরসূরীগণ আজ একেবারে ভূমিহীন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। নিজেদের ভিটেমাটি হারিয়ে কয়েক কাঠা মাত্র ভূমিতে আজ তাদের জীবনযাপন, ইস্পাত কারখানায় চাকরিমাত্র সম্বল। সে চাকরিও সকলের জোটেনি, বংশের অনেকেই আজ নিতান্তই বেকার, হতাশাগ্রস্ত।[৩১]

শুধু আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, মানুষের মনোজগতেও আসে বিরাট পরিবর্তন। গ্রামে থাকতে যে লোকটা এক হাঁটু কাদা মেখে বলদ, লাঙ্গল নিয়ে হ্যাট হ্যাট্ -হেই হেই করে মাঠে চাষ করত, শিল্পায়নের ফলে সেই মানুষটা জমি হারাল, চাষবাস বন্ধ হল। মাঠের যে খোলামেলা পরিবেশে তিনি কাজ করতেন সেই কাজে একটা সৃষ্টিশীলতা ও সন্তোষ ছিল। তার প্রভাব রয়েছে তাঁর মনে, তাঁর সংস্কৃতিতে। এই পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল তাকে। পেটের ক্ষুধা মেটানোর জন্য তিনি কারখানায় যোগ দিলেন অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে। লোহার পাত পেটাতে পেটাতে তিনি বারে বারেই অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। মন চলে যেত ফেলে আসা গ্রামের দিকে। তার তো ফসল ফলাবার কথা, অথচ আজ তাকে লোহার পাত পেটাতে হচ্ছে। কৃষি কাজে তার যে দক্ষতা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেল। এই যে ক্ষতি তা পূরণ হবার নয়। হাতে নগদ টাকা এলেও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছেন অনেকেই। বাস্তুচ্যুত হওয়ার ফলে আঘাত পড়েছে তার প্রতিবেশী পরিবৃত নিরাপত্তাবোধের উপর।[৩২]

গ্রামের প্রবীণ অধিবাসীরা তাদের সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন গ্রাম ভেঙে শিল্প হল, হল নগরায়ণ, আর নগরায়ণের সাথে সাথে প্রবেশ করল আধুনিকতার নানা পাপ। মানুষের ভাষা, ব্যবহার দ্রুত বদলাতে লাগল। সরল গ্রাম্য মানুষগুলো চিরাচরিত পেশা ছেড়ে নানান পেশা অবলম্বন করলেন। কেউ টিকে থাকলেন, কেউ বা হেরে গেলেন। নির্বাচিত ক্ষেত্র সমীক্ষায় গ্রামের প্রবীণ মানুষেরা জানিয়েছেন - সত্তর বছর আগের সরল গ্রাম্য মানুষগুলো আজ অনেক বেশী স্বার্থপর, অনেক বেশী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। এখানকার পরবর্তী প্রজন্ম ব্যক্তিগত সুখ আর আত্মকেন্দ্রিক ভাবনাকে চরিতার্থ করার জন্য আজ

সমাজ, সুনীতি, আদর্শ, বিবেক প্রত্যেক মুহূর্তে পিষ্ট করে যেতে দ্বিধা করে না। ফেলে আসা গ্রামের বৃদ্ধ মানুষেরা আজ প্রত্যেকেই স্বীকার করেন হারানো সেই গ্রামে সুখের উপকরণ ছিল না ঠিকই, কিন্তু মোটামুটি শান্তি ছিল, বিশ্বাস ছিল, নির্ভরতা ছিল। যার উপর ভারসা করে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত। আর আজ, প্রযুক্তির উন্নয়ন সুখের অনেক উপকরণ যুগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু শান্তি হারিয়ে গেছে চিরতরে। মানুষের হৃদয় বলে যে একটা বস্তু থাকার কথা, সেটা আজ শুধুই একটা শব্দ মাত্র![৩৩]

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলাই যায় শিল্পায়নের জন্য কৃষিজমি হস্তান্তর তথা আধিগ্রহণের প্রশ্নটি নিয়ে তুমুল বাদ প্রতিবাদ চললেও কৃষি শিল্পের বিরোধী নয়, শিল্পায়ন কৃষিজীবীর শত্রু নয়। কৃষিজীবীর কাছে জমি কেবল আয়ের উৎস নয়, জীবনের নিরাপত্তার সম্বলও বটে। এহেন একজন মানুষকে জীবন ও জীবিকার প্রধান নির্ভরটি হাতছাড়া করতে হলে তিনি তো নিরাপত্তার অভাববোধ করবেনই, তাঁকে হাতে কিছু টাকা ধরে দিলে সেই উদ্বেগ দূর করা সম্ভব নয়। সরকারি রির্পোটে, আচরণে কোথাও এই ধরনের কোন ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় না।[৩৪]

এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, যদি দুটি জিনিসকেই পাশাপাশি রাখা যায়। একদিকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ, অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা---- যা থেকে ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটানো যাবে। কৃষিজীবীদের ক্ষতিপূরণের জন্য সরাসরি টাকা দেওয়া অবশ্যই জরুরি, কিন্তু যথেষ্ট নয়। তাঁরা যাতে জমি আধিগ্রহণের পর তাঁদের জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, নতুন করে ভালোভাবে বাঁচতে পারে সেজন্য সরকারকেও তৎপর হয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে।[৩৫] দুর্গাপুর থেকে সিঙ্গুর সর্বত্রই এই উদ্যোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

হয়ত উন্নয়নের স্বার্থেই উচ্ছেদ। কিন্তু উচ্ছেদ মানেই তো কতকগুলো মানুষকে জোর করে উঠিয়ে দেওয়া নয়। উচ্ছেদকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা উচিত। গ্রামের সাধারণ কৃষিজীবী মানুষ শিল্পায়নের বা উন্নয়নের বিরোধী নন, কিন্তু বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে নিজেদের কৃষিজমি, ভিটেমাটি আঁকড়ে থাকার চেষ্টা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। বাঁচার অধিকার সকলেরই আছে, তা অস্বীকৃত হলে পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো তৈরি হয় অক্ষম অভিমান, কখনো দুরন্ত বিক্ষোভ।

সূত্র নির্দেশ

১. কেমব্রিজ ওয়ার্ল্ড গেজেটিয়ার, এ টু জেড অফ জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন, এডিটেড ডঃ ডেভিড মুনরো, পৃ- ১৮২।

২. Cencus 1951 West Bengal district handbook Burdwan A. Mitra of the Indian Civil Service, Superintendent of Census Operation and Joint Development Commissioner, West Bengal, p. 212.

৩. শিবশঙ্কর ঘোষ, পুরাতত্ত্ব কৃষ্টি ও সামাজিক বিবর্তনে রাঢ়ের গোপভূম, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা- ৭০০০১২, ৭ই ডিসেম্বর, ২০০৬, পৃ. ৩৬৭-৩৯৯

৪. 'দুর্গাপুরে দুঃসাহসিক ডাকাতি', আনন্দবাজার পত্রিকা (মফঃস্বল বার্তা), ২১.১২.১৯৫৪, মঙ্গলবার, পৃ. ৭

৫. প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের ইতিহাস, রূপকল্প প্রকাশন, বেনাচিত, দুর্গাপুর-১৩, ১৯৮৪
৬. প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের ইতিহাস, রূপকল্প প্রকাশন, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ১৩, ১৯৮৪, পৃ. ১৮২
৭. Cencus 1951 West Bengal district handbook Burdwan A. Mitra of the Indian Civil Service, Superintendent of Census Operation and Joint Development Commissioner, West Bengal, p. 212.
৮. মধু চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গে, সাহিত্য শ্রী, কলকাতা ১৯৯১, পৃঃ ১৫৬-১৫৮
৯. এস.কে.এন চৌধুরী, 'দুর্গাপুরের শতাব্দী প্রাচীন শিল্পকারখানা' শীর্ষক প্রবন্ধ, দুর্গাপুর জনজীবন পত্রিকা, ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০৫
১০. 'Durgapur Barrage Inaugurated.... Radhakrishnan's', Amrit Bazar Patrika, 10 August 1955, Editor Tushar kanti Ghosh.
১১. প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের ইতিহাস, রূপকল্প প্রকাশন, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ১৩, ১৯৮৪, পৃঃ ১৮৭
১২. District Industrial Profile, 2017-18, Paschim Bardhaman, MSME Development Institute, Ministry of MSME, Govt. of India, Kolkata, 31 March 2018, pp. 25-26.
১৩.প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের ইতিহাস, রূপকল্প প্রকাশন, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ১৩, ১৯৮৪, পৃঃ ১৮১
১৪. প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের ইতিহাস, রূপকল্প প্রকাশন, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ১৩, ১৯৮৪, পৃঃ ১৮১-১৮২
১৫. Nitish Senguta, "builders of Modern India', Dr Bidhan Chandra Roy, Publiction Divistion, Ministry of Information and Broadcasting Government of India 2002 (Saka 1923), p. 220
১৬. 'Ananda Gopal Mukherjee...',--- India Today 27 October 2014, 15:18:1 IST
১৭. প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের ইতিহাস, রূপকল্প প্রকাশন, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ১৩, ১৯৮৪, পৃঃ ১৮৭
১৮. সাক্ষাৎকার : ২২.০৫.২০২৭ সুশীল ভট্টাচার্য- দুর্গাপুরের বাসিন্দা, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক, দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন, অতীত স্মৃতিচারণায় তিনি, আনন্দগোপাল মুখার্জীর কথা বলেছেন।
১৯. আধুনিক শিল্পনগরীর চারপাশে জীবন ও জীবিকার পালাবদল : একটি আঞ্চলিক সমীক্ষা, ইস্পাতের চিঠি, সম্পাদক পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, শারদ সংখ্যা, ১৩৮৭, বর্ষ ৯, সংখ্যা ১, পৃ. ৩০
২০. মধু চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গে, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৯১ ।
২১. সাক্ষাৎকার, শ্যাম রায়, জগুরবাঁধ প্লট (রায় পাড়া), গোপালমাঠ, দুর্গাপুর, Ex-Serviceman DSP, দুর্গাপুর ০৩.০১.২০০৬।
২২. গোস্বামী দাস রায়, ভিড়িঙ্গীর বাসিন্দা। ১৯৫০ থেকে ৭০-এর দশক পর্যন্ত পেশায় রানীগঞ্জ রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল লেখক ছিলেন। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহের খাতা থেকে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।
২৩. প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের ইতিহাস, রূপকল্প প্রকাশন, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ১৩, ১৯৮৪, পৃ. ১৮৩
২৪. সব্যসাচী বসুরায়চৌধুরী, 'সহানুভূতির প্রশ্ন নয়, পূর্নবাসন একটি অধিকার', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০.১২.২০০৬।
২৫. কল্যাণ স্যান্যাল, 'এই শিল্পায়ন জরুরি, কিন্তু কর্মসংস্থানের জন্য যথেষ্ট নয়', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.১২.২০০৬।
২৬. শিব বসু, 'ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠছে, এটাই আশা, সুযোগও' আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১.০১.২০০৭।
২৭. অমিত চক্রবর্তী, "সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়' সম্পাদক সমীপেষু, আনন্দবাজার পত্রিকা, ০৩.০৪.২০০৭।

২৮. Walter Fernandes, 'Singur and the Displacement Scenario', *Economic and Political Weekly*, Vol. 42, Issue No. 03, 20 Jan, 2007.

২৯. 'আধুনিক শিল্প নগরীর চারপাশে জীবন ও জীবকার পালাবদল---- একটি আঞ্চলিক সমীক্ষা, *ইস্পাতের চিঠি,* সম্পাদক পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, শারদ সংখ্যা, ১৩৮৭, বর্ষ ৯, সংখ্যা ১, পৃ. ৪৫

৩০. মধু চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গে, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৩১৩-৩১৭ ।

৩১. প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের ইতিহাস, রূপকল্প প্রকাশন, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ১৩, ১৯৮৪, পৃ. ১৫৩

৩২. সুমন ঘোষ, কৃষি জমিতে শিল্প, আনন্দবাজার পত্রিকা, ০৬.১০.২০০৬

৩৩. দুর্গাপুর কি ছিল কি হয়েছে শীর্ষক প্রবন্ধ, প্রবণবেশ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান চর্চা, বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠী, বর্ধমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩০শে নভেম্বর, ২০০১, পৃ. ৫৩৩।

৩৪. Sarkar Abhirup, Development and Displacement: Land Acquisition in West Bengal Author(s): Source: Economic and Political Weekly, Apr. 21-27, 2007, Vol. 42, No. 16 (Apr. 21-27, 2007), pp. 1435-1442 Published by: Economic and Political Weekly Stable URL: https://www.jstor.org/stable/4419496

৩৫. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'দেশ নয়, মানুষ নয়, ক্ষমতা দখলই বড়ো কথা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬.০৩.২০০৭।